তৃতীয় অধ্যায়

লেখিকার কলমে পুরুষতন্ত্রের প্রতিবাদ

ইতিহাসের পৃষ্ঠা ওল্টালে দেখা যায় সুদূর অতীত থেকেই নিয়মনীতি এবং বিধি-নিষেধের বেড়াজালে আবর্তিত ছিল নারীসমাজের অবস্থান। যদিও বৈদিক যুগে নারী অনেকটা স্বাধীন ছিল। নারী-পুরুষ উভয়েই একত্রে যজ্ঞ সম্পাদন করতেন। ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলে ১৭৩তম সূত্রে বলা হয়েছে—

"হে ইন্দ্র, মর্ত্ত হোতা স্তোত্রাভিলাষী দেবতাদের
স্তব করে স্ত্রী-পুরুষের যজ্ঞ সম্পাদন করছে।"[১]

এছাড়া নারীদের 'মৌঞ্জীবন্ধন' ছিল যা উপনয়নের একটি বিশেষ চিহ্ন বোঝাত। সাবিত্রীমন্ত্র জপ ও বেদের অধ্যাপনার অধিকারও ছিল। পুরাকালে প্রসিদ্ধ ধর্মশাস্ত্রকার যম বলেছেন—

"পুরাকল্পেতু নারীণাং মৌঞ্জীবন্ধনমিষ্যত
অধ্যাপনঞ্চ বেদানাং সাবিত্রীবাচনস্তথা।।"[২]

অর্থাৎ 'পুরাকালে নারীগণের মৌঞ্জীবন্ধন, বেদের অধ্যাপনা এবং সাবিত্রীবচনে অধিকার ছিল।' পুরুষের যেভাবে একাধিক বিবাহের অধিকার ছিল তেমনি বহু বিবাহে ইচ্ছা প্রকাশ করলে নারীরাও তা করতে পারতেন। এ প্রসঙ্গে উল্লিখিত বেদের অষ্টম মণ্ডলে ৫৯ সূত্রে রয়েছে—

"দুইজন অশ্বী, একই স্ত্রীর সহিত বাস করেন
এমন দুই পুরুষের মত একসংগে বাস করতেন।"[৩]

সে সময় বিধবাদের পুনরায় বিবাহের অধিকারও প্রাপ্ত ছিল। ঋগ্বেদের একটি সূত্রে আছে স্বামীর শবদেহকে সমাধিস্থ করার পর নারী যাতে পুনরায় সাংসারিক জীবনে পদার্পণ করে তার উপদেশ দেওয়া হয়েছে—

"এই সকল নারী বৈধব্য দুঃখ অনুভব না করে
মনোমত পতিলাভ করে অঞ্জন ও ঘৃত স্পৃষ্ট হয়ে

গৃহে প্রবেশ করুন।"[৪]

এছাড়া ঋগ্বেদে শ্লোকে আছে—

"স্বয়ং সা মিত্রং বনুতে জনে চিৎ" অর্থাৎ নারীর নিজের পছন্দের সংগীর সঙ্গে বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হওয়ার অধিকার ছিল। কিন্তু লক্ষণীয় যে, বৈদিক যুগে নারীর অবস্থা উন্নত হলেও সন্তান জন্মের ক্ষেত্রে কন্যাসন্তান অপেক্ষা পুত্রসন্তানই অভিপ্রেত ছিল। ঋগ্বেদে সুস্পষ্টভাবে উল্লিখিত না হলেও 'বিবাহকেন্দ্রিক মন্ত্রোচ্চারণে' শুধুমাত্র পুত্রসন্তানের জন্য প্রার্থনা করা হত। ঋগ্বেদে যেখানে নারীর নানা অধিকারের কথা ব্যক্ত হয়েছে সেখানেই আবার রয়েছে নারী অবদমন, যেমন— "পুরুষ খেয়ে এঁটোটা স্ত্রীকে দেবে" (ভূক্ত্বে গচ্ছিষং বধৈব দদ্যাৎ) অথবা স্ত্রী ছায়ার মতো স্বামীর অনুগামিনী হবে। ব্রাহ্মণ্যযুগে নারীকে অবরোধে রাখার প্রচেষ্টা চলতে থাকে আর এই প্রচেষ্টাই শেষপর্যন্ত নারীদেরকে পিঞ্জরাবদ্ধ বিহঙ্গীতে পরিণত করে। নারীদের মতো শূদ্রদের প্রতিও প্রাচীন ভারতে নানা অবমননের দৃশ্য দেখা যায়। সূত্র সাহিত্যে তো বলাই হয়েছে— সাপ, বেজি, কালোপাখি, শূদ্র এবং নারীর হত্যা করলে প্রায়শ্চিত করতে হয় না। নারীকে বলা হত ঊনমানব। অর্থাৎ অর্ধেক মানব। তার মানে নারীরা যে মানুষ, সমাজ তা মেনে নিতে রাজি ছিল না। নারীরা 'ভোগ্যবস্তু' বা 'পণ্যদ্রব্য' রূপে পরিগণিত হত। আমাদের এই ধারণার সঙ্গে পরিচয় ঘটে উত্তরবৈদিক যুগ থেকে মহাকাব্যের যুগ পর্যন্ত। তৈত্তিরীয় সংহিতায় নারীকে ভোগ্যবস্তু ভেবে বলা হয়—

"পশু ভূমি স্ত্রীণামণতিভোগঃ অর্থাৎ পশু, জমি এবং
স্ত্রীকে অত্যধিক ভোগ করা ঠিক নয়।"[৫]
(২/৩/১০/৭)

আর এই ভোগ্যবস্তুর সঙ্গে যেমন খুশি ব্যবহার করা চলে। তাই তো

সোমযোগে রয়েছে—

"বজ্র বা লাঠি দিয়ে নারীকে মেরে দুর্বল করা উচিত
যাতে নিজের দেহ বা সম্পত্তির ওপরে তার কোনো
অধিকার না থাকে।"[৬]

স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে নিজের শরীরের উপর নারীর কোনো অধিকার ছিল না। সমাজে নারীর ইচ্ছা-আকাঙক্ষা যেভাবে মূল্যহীন ছিল তেমনি নারীকে প্রতিপদে হেয় প্রতিপন্ন করা হত। মহাকাব্য থেকে আরম্ভ করে পুরাণ, ধর্মশাস্ত্র, স্মৃতিতে নারীর অসম্মানের চিত্র নজরে পড়ে। শতপথ ব্রাহ্মণে বলা হয়েছে—

"যজ্ঞকালে কুকুর, শূদ্র ও নারীর দিকে তাকাবে না।"

অন্যত্র আছে—

"স্ত্রী, শূদ্র, কুকুর, কালোপাখি এদের দেখো না নইলে
শ্রী ও পাপ, জ্যোতি ও অন্ধকার, সত্য ও মিথ্যা
মিশে যাবে।"[৭] *(১৪/১/১/৩১)*

তাই সমাজে নারী সম্পর্কে অভিমত ছিল 'নারী নরকের দ্বার'। সে সময়ে নারীকে অস্থাবর সম্পত্তি হিসেবে দেখা হত। বিবাহ পরবর্তীকালে কন্যাদের পিত্রালয়ের একজন সদস্যরূপে গণ্য করা হত না, সে হয়ে যেত আত্মীয় স্বরূপ। সে অবস্থায় কন্যার পিতার কন্যামূল্য চাওয়ার সুযোগ ছিল। ফলস্বরূপ নারী 'পণ্যদ্রব্যে'তে পরিণত হয়। 'বৈদিক সংহিতার' যুগের মন্ত্রেও এরূপ ভাবনার আভাস পাওয়া যায়—

"অশ্রবং হি ভূরিদাবওরা বাং বিজামাতুরুত বা ঘা স্যালাৎ।
অথা সোমস্য প্রযতী যুবভ্যা মিন্দ্রাগ্নী স্তোমং জনযামি নব্যম।।"[৮]

প্রাচীনকাল থেকেই নারী হয়ে উঠেছে পুরুষশাস্ত্রকারদের স্বনির্মিত প্রতিমা যদিও 'মনুসংহিতায়' রয়েছে—

"যত্র নার্যস্তু পূজ্যন্ত রমন্তে তত্র দেবতা
যত্রৈতাস্ত ন পূজ্যন্তে সর্ব্বাস্তত্রাফলঃ ক্রিয়া।।"[৯]

অর্থাৎ "যে পরিবারে নারীগণ সম্মানিত হন সেখানে দেবগণ প্রসন্ন থাকেন। আর যেখানে নারীদের সমাদর নেই যাগাদি ক্রিয়াকর্ম সেখানে সমস্তই ব্যর্থ হয়ে যায়।" আবার সেই "মনুসংহিতায়"ই বলা হয়েছে—

"পিতা রক্ষতি কৌমারে ভর্ত্তা রক্ষতি যৌবনে।
রক্ষন্তি স্থবিরে পুত্রা ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি।।" [১০]

অর্থাৎ দেখা যায় নারীর কোন স্বাধীনতা স্বীকার করেনি পুরুষতন্ত্র। তাই তো স্মৃতিশাস্ত্রে বলা হয়েছে 'পতিসেবাই নারীর পরমধর্ম', 'পতিপুণ্যে তার স্বর্গবাস, পাপে নরক' স্পষ্টই বোঝা যায় নারীর জায়া, জননী ও গৃহিণী এই চিহ্নায়ক পরিচয়ের বাইরে নারীর কোন স্বাতন্ত্রই মেনে নিতে পারেনি পুরুষতান্ত্রিক সমাজ। নির্দ্ধারিত নিগড় মেনে চলা এবং সংসারে নির্বোধ ভূমিকার উপর নির্ভর করত নারীর সামাজিক মূল্য। এমনকি, পুরুষের সঙ্গে তার সম্বন্ধ থাকা না থাকা দিয়েই কুমারী, সধবা, বিধবা ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হত তাকে। এছাড়াও মনুষ্যত্ব বিকাশের ক্ষেত্রে যে প্রধান উপকরণ শিক্ষা, তা থেকেও বঞ্চিত ছিল নারীসমাজ। সমাজে প্রচলিত ধারণা ছিল মেয়েরা পড়াশোনা শিখলে বিধবা হয় নতুবা চরিত্র স্খলন ঘটবে। উনিশ শতকের প্রগতিশীল ও আধুনিক ভাবধারায় প্রভাবিত ব্যক্তিবর্গ বুঝতে পেরেছিলেন, নারীসমাজ পুরুষতন্ত্রের নির্মিত বেড়াজাল থেকে বেরোতে না পারলে যেভাবে সমাজের উন্নয়ন সম্ভব নয় তেমনি দেশেরও। তাই যেমন— রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, গৌরমোহন বিদ্যালংকার, রাধাকান্ত দেব এমন অনেকেই নারীসমাজের উন্নয়নকল্পে স্ত্রীশিক্ষার

উপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন, নারী-শিক্ষাই নারীকে সমস্ত প্রতিবন্ধকতার বেড়াজাল থেকে মুক্তি দিতে পারে। এই শিক্ষাই নারীকে পিতৃতন্ত্র পরিচালিত সামাজিক প্রতাপের চাতুর্য বুঝতে সক্ষম করিয়েছিল। নারী বুঝতে পারে তাঁরা দীর্ঘকালধরে পিতৃতন্ত্রের দ্বারা পরিচালিত, নিয়ন্ত্রিত, নিষ্পেষিত। অর্থাৎ পিতৃতন্ত্রের কূট পরিকল্পনার শিকার হয়েছে নারী। নারীর এই ক্ষোভ, বেদনা, যন্ত্রণা প্রকাশের মাধ্যম হয়ে দাঁড়ায় তাঁদের লেখনী। ধীরে ধীরে নারীদের লেখায় প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর শোনা যেতে থাকে। ১৮৩৫ সালে 'সমাচার দর্পণে' চুঁচুড়ায় মহিলাদের লেখা দুটি চিঠির বয়ানে প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর শোনা যায়। হয়ত এটাই প্রথম নারীবাদী প্রতিবাদ। প্রতিবাদ শব্দের অর্থ কোনো কথা বা কাজের বিরুদ্ধে আপত্তি জানানো। এই প্রতিবাদ মানব মনে জন্ম হয় বৈষম্য থেকে।

মানুষ মূলত দুভাবে প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠতে পারে প্রথমতঃ মানুষ ব্যক্তিগত জীবনে অত্যাচার বা শোষিত হলে, দ্বিতীয়তঃ জন সমাজের স্বার্থে। আবার এই প্রতিবাদ হয় কখনো সরবে কখনো বা নীরবে।

বিভিন্নভাবে প্রতিবাদ ঘটে— যেমন—

(১) ব্যক্তির অন্যায়ের বিরুদ্ধে।

(২) পারিবারিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে।

(৩) সামাজিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে।

(৪) অর্থনৈতিক শোষণের বিরুদ্ধে।

(৫) প্রশাসনিক অবিচার / অত্যাচারের বিরুদ্ধে।

(৬) মূল্যবোধহীন শিক্ষা-সংস্কৃতির বিরুদ্ধে।

(৭) রাজনৈতিক মতাদর্শের বিরুদ্ধে।

(৮) ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে।

পুরুষশাসিত সমাজে নারী ও পুরুষকে যে ভিন্ন চোখে দেখা হয় আর এই বৈষম্য থেকেই প্রতিবাদী চেতনা বা ভাবনা জন্ম নেয়। এই প্রতিবাদীচেতনার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় সাহিত্যের প্রাঙ্গনেও। পাশ্চাত্য সাহিত্যে **Arnold Wesker** এর **'CARIT AS' (1981)** এ দেখি নারীর বন্ধনের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদের ছবি। এছাড়া নরওয়েজিয়ান নাট্যকার **Ibsen (1828-1906) 'DOLL's HOUSE'** নাটকেও রয়েছে নায়িকা নোরার স্বামীর ভণ্ডামীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। **George Orwell** এর **'ANIMAL FARM' (1945)** ও **'NINETEEN EIGHTY FOUR' (1949)** উপন্যাস দুটিতে তীব্র প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে স্টালিনের শাসনকালে রাশিয়ানদের উপর অমানুষিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে। **John Osborne** এর **'LOOK BACK IN ANGER' (1956)** নাটকে নায়ক জিমি প্রতিবাদ ও ধিক্কার জানিয়েছে প্রচলিত সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে। এভাবে পাশ্চাত্য সাহিত্যে প্রতিবাদীচেতনা উপজীব্য রূপে উঠে আসে। এছাড়া ঋগ্বেদেরই অক্ষসূক্ত ১০/৬৪-তে রয়েছে প্রাচীন ক্রীড়া পাশা খেলার প্রতি ধিক্কার ও তার বিরুদ্ধে সামাজিক প্রতিবাদ। পাশাখেলার প্রতি উচ্চশ্রেণীর থেকে সাধারণ শ্রেণীর মানুষের আকর্ষন, কিন্তু এই আকর্ষনের ফলস্বরূপ উভয়শ্রেণীকে একে অপরের মুখোমুখি পর্যন্ত দাড়াতে হয়। এমনকি সামাজিক প্রতিবাদ গড়ে ওঠার আভাসও রয়েছে পাশাখেলার বিরুদ্ধে।

শূদ্রকের 'মৃচ্ছকটিকম্' নাটকে চারুদত্ত প্রতিবাদ জানিয়েছেন অন্যায়কারী ও অত্যাচারী শকারের বিরুদ্ধে। পাশাপাশি দুর্দক, রেভিল, শর্বিলক, মৈত্রেয় প্রমুখেরা দুষ্কৃতকারী রাজা পালক ও সহচরবৃন্দের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী ভূমিকায় অংশ নিয়েছেন। ফলস্বরূপ প্রতিকার সম্ভব হয় সামাজিক দুরাচার ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে প্রতিবাদীচেতনা দেখা যায় 'মনসামঙ্গল' কাব্যের দেববিদ্রোহী চাঁদ সদাগরের চরিত্রে। সর্পদেবী মনসা তার পূজা মর্ত্যে প্রচলিত করার অভিপ্রায়ে চাঁদ সদাগরকে বেছে নেন। কারণ তিনি জানেন চাঁদ সদাগর পূজা করলেই সমাজে তাঁর পূজা প্রচলিত হবে। চাঁদ সদাগরকে পূজা করার কথা বললে চাঁদ অস্বীকার করেন, তখন ভয় দেখিয়ে, বিপদে ফেলে পূজা করানোর প্রচেষ্টা চালান মনসা। চাঁদ সদাগর রাজী না হওয়ায় ছয়পুত্রের মতো সপ্তম পুত্র লখিন্দরের প্রাণ কেড়ে নেন। শেষপর্যন্ত পুত্রবধূ বেহুলার স্নেহময় অশ্রুকাতর অনুরোধে, একান্ত অনিচ্ছায় পেছন ফিরে বাঁ হাতে ফুল ছুঁড়ে দিয়ে মনসার পূজো করেন চাঁদ। এই পূজো করাতে চাঁদের দৃঢ়তা অক্ষুন্নই থাকে। এছাড়া তৎকালীন সমাজে সহমরণ প্রথা প্রচলিত থাকা সত্ত্বেও চাঁদ তার বিধবা পুত্রবধূদের নির্মম সমাজের প্রচলিত নিয়মনীতির যূপকাষ্ঠে বলি হতে দেননি। এখানে তৎকালীন সমাজব্যবস্থাকে অস্বীকার করার মধ্য দিয়ে চাঁদের মধ্যে এক প্রতিবাদী চেতনা লক্ষ্য করা যায়। উল্লেখ্য যে প্রতিবাদীচেতনা কবিকঙ্কণ মুকুন্দ চক্রবর্তীর 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যেও 'পশুদের ক্রন্দন' অংশে লক্ষণীয়। এ অংশে রূপকের মাধ্যমে শাসক শ্রেণীর সাধারণ মানুষের ওপর অত্যাচারের কথা ব্যক্ত হয়েছে। সাধারণ মানুষের দুঃখ-দুর্দশার জন্য দায়ী শাসকশ্রেণী যার বিরুদ্ধে মুকুন্দ চক্রবর্তীর প্রতিবাদী চেতনার প্রকাশ ঘটে। মধ্যযুগের সমাপ্তিলগ্নে অর্থাৎ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষপর্বে রচিত শাক্ত পদাবলীতে রামপ্রসাদ সেন প্রতিবাদ জানিয়েছেন সমাজের অসাম্যের বিরুদ্ধে। একজন প্রয়োজনের অতিরিক্ত সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছে অন্যদিকে দেখা যায় কেউ ন্যূনতম সুযোগ সুবিধা ভোগ করতে পারছে না। সমাজের অন্যায়, বৈষম্যের বিরুদ্ধে রামপ্রসাদ জগজ্জনীর কাছে অনুযোগ করেছেন—

"কারেও দিলে ধনজন মা, হয় হস্তীরথী জয়ী
আর কারও ভাগ্যে মজুর খাটা
শাকে অন্ন মেলে কই?"

উনিশ শতকে নবজাগরণের ফলে বাঙালির মনোজগতে অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী চেতনার প্রকাশ ঘটে। রাজা রামমোহন রায়কে 'সহমরণ বিষয়ে প্রবর্তক ও নিবর্তকের দ্বিতীয় সম্বাদ' (১৮১৯) পুস্তকে 'সহমরণ' প্রথার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাতে দেখা যায়। আর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহের বিরুদ্ধে "কসাচিৎ উপযুক্ত ভাইপোস্য' ছদ্মনামের আড়ালে অনেক লেখালেখি করেন। বাংলা সাহিত্যের প্রথম সামাজিক নাটক রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীন কুল সর্বস্ব'তেও কৌলীন্য প্রথার দোষ ও অসঙ্গতি নিয়ে নিন্দা ও বিদ্রূপ রয়েছে। এছাড়া 'নবনাটক' এ বহুবিবাহের কুফল দেখিয়েও প্রতিবাদ আছে।

এদিকে মধুসূদন সমাজ ও নীতি বিরোধী কর্মের বিরোধিতা করে 'একেই কি বলে সভ্যতা' লেখেন। আর 'বুড়ো শালিকের ঘাড়েরোঁ' এই প্রসহনটিতে মধুসূদন ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করেন ভক্তপ্রসাদ চরিত্রের প্রতি। সে নানাবিধ কুকর্মে জড়িত তথাপি তার সতর্কদৃষ্টি পুত্রের ধর্মাচরণের প্রতি। মুসলমানের ছোঁওয়া খাদ্য খাওয়ার বিষয়ে ঘোর বিরোধী অথচ তার মুসলমান স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্ক। এককথায় মধুসূদন ভক্তপ্রসাদ চরিত্রের মাধ্যমে সততা ও ধার্মিকতার মুখোশধারী ব্যক্তিদের তুলে ধরেছেন। নীলকর সাহেবদের প্রজাদের উপর অকথ্য অত্যাচার ও শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী চেতনা প্রকাশ পায় দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটকে। বঙ্কিমচন্দ্রের লেখনীতেও প্রকাশ পায় প্রতিবাদী চেতনা। 'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র অত্যাচারী, শোষণকারী জমিদারের প্রতি প্রতিবাদ জানান। আর অত্যাচারী জমিদারের বিরুদ্ধে সরাসরি বিরোধিতা করে লেখেন—

> *"জীবের শত্রু জীব, মনুষ্যের শত্রু মনুষ্য বাঙ্গালী কৃষকের শত্রু বাঙ্গালী ভূস্বামী। ... জমিদার নামক বড় মানুষ, কৃষক নামক ছোট মানুষকে ভক্ষণ করে।"*[১১]

বঙ্কিমচন্দ্রের 'লোকরহস্য' (১৮৭৪) গ্রন্থের 'গর্দভ', 'ব্যাঘ্রাচার্য্য', 'বাবু' এবং 'কমলাকান্তের দপ্তর' এর 'বসন্তের কোকিল', 'বিড়াল', ইত্যাদি রচনায় প্রতিবাদী চেতনা লক্ষণীয়। এছাড়াও অন্যান্য লেখকদের নাটক-উপন্যাস-কবিতায়ও প্রতিবাদী চেতনার প্রকাশ ঘটেছে। বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় প্রতিবাদীচেতনা উপজীব্যরূপে উঠে আসলেও বাংলা সাহিত্যের সবচেয়ে কনিষ্ঠতম শাখা 'ছোটগল্পে' প্রতিবাদী চেতনার প্রকাশ ঘটেছে অনেক পরেই। রবীন্দ্রনাথের 'দেনাপাওনার' (১৮৯১) মাধ্যমে প্রথম সার্থক ছোটগল্পের যাত্রা শুরু হয়। এই গল্পটিতে রবীন্দ্রনাথের পণ প্রথার বিরুদ্ধে ব্যঙ্গমিশ্রিতশাণিত ভাষায় প্রতিবাদী চেতনার প্রকাশ ঘটে। এছাড়া রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অন্যান্য গল্প যেমন 'স্ত্রীর পত্র', 'অপরিচিতা', 'পাত্র ও পাত্রী', 'শাস্তি', 'যজ্ঞেশ্বরের যজ্ঞ', 'ত্যাগ', ইত্যাদি গল্পেও প্রতিবাদীচেতনা লক্ষণীয়। সমাজে জাতপাত, পণপ্রথা, দরিদ্র অসহায় মানুষের ওপর সমাজের উঁচুশ্রেণীর অত্যাচার, অবিচার এবং সমাজে প্রচলিত নানা অন্যায় অনুশাসন সমাজসচেতন, মানবিক মূল্যবোধে বিশ্বাসী লেখকবর্গের মনোজগতকে বিশেষভাবেই প্রভাবিত করেছিল বলেই তাঁরা সমাজের সকল অন্যায়, অবিচারের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করেছিলেন। যেমন— আশাপূর্ণা দেবীর 'সীমারেখার সীমা', 'তাসের ঘর', 'অভিনেত্রী', 'আত্মহত্যা', 'বিবি বেগমের শিবতলা' ইত্যাদি গল্পে পুরুষশাসিত সমাজে নারীর প্রতি হওয়া সমস্ত অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে কলম ধরতে দেখা যায়। পণপ্রথার বিরুদ্ধে রয়েছে শংকর দাশগুপ্তের 'অন্ধসুখ', নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'কনে দেখা আলো', ঋতুপর্ণ বিশ্বাসের 'রাজসেবা', বিশ্বনাথ ঘোষের 'অভিকর্ষ', প্রভৃতি গল্পকারদের গল্প। জাত-পাতের মতো সংকীর্ণ কুসংস্কারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ দেখা যায় অনেক গল্পকারদের লেখনীতে। যেমন— এ মান্নাফের 'হারু ঠাকুর', উৎপলেন্দু মণ্ডলের লেখা 'অন্ধকারের নান্দীপাঠ' প্রভৃতি। বাংলা সাহিত্য জগতের অন্যতম লেখিকা আশালতা সিংহের গল্পেও প্রতিবাদী চেতনার আভাস পাওয়া যায়। আশালতার এই প্রতিবাদ উঠে আসে

পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধে। পুরুষশাসিত সমাজব্যবস্থায় নারীর ওপর চাপিয়ে দেওয়া সমস্ত অন্যায় নিয়মনীতির বিরুদ্ধাচরণ করেছেন তিনি। পণপ্রথা, সমাজে নারী ও পুরুষকে ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখার পাশাপাশি বিভিন্ন অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদীচেতনার আভাস পাওয়া যায় তাঁর গল্পে।

পুরুষশাসিত সমাজে পাত্রী নির্বাচনের নামে কন্যাদের অপদস্থ করা, নিজেদের লিপ্সাকে চরিতার্থ করার অভিপ্রায়ে বিয়ের নামে কন্যাপক্ষকে শোষণ করার মতো বর্বরতা, নারী-পুরুষের জীবনচর্যায় বৈষম্য টানার মানসিকতা ইত্যাদি বিষয়বস্তুচয়নে সহজেই বোধগম্য হয় পুরুষশাসিত সমাজের এই অনাচারের বিরুদ্ধে ছিল আশালতার ঘোর আপত্তি। তার 'বদলে', 'অভিমান', 'নারীর মূল্য', 'কনে দেখা', 'নূতন প্রথা', 'বিনা পণের মর্যাদা' প্রভৃতি গল্পে পাত্রী নির্বাচনের মত নিষ্ঠুর প্রথার স্বরূপ এবং তার বিরুদ্ধে রয়েছে প্রতিবাদী স্বর।

'কালোমেয়ে' গল্পটি 'দেশ' পত্রিকায়, বর্ষ ৭ : সংখ্যা ৭-এ, ১৯৪০এর ৬ জানুয়ারি প্রকাশিত হয়। গল্পটিতে দেখা যায় গল্পের নায়িকা অরুণাকে পাত্রপক্ষ দেখতে আসবে। অরুণার মা অরুণাকে রূপচর্চার জন্য স্কুল বন্ধ করে দেন। কারণ তিনি শুনেছিলেন—

> *"ভিতরে কিছু বর্ষণ আর উপরে কিছু ঘর্ষণ করলে হাজার কালো মেয়ে হোক তার একটু জৌলুস খুলবেই।"*[১২]

তাই ভালো খাইয়ে ও ভালো মাখিয়ে মেয়েকে তৈরী করা হয়েছে। অরুণা ভালো গান গাইতে পারে, ইংরেজি জানে, ম্যাট্রিক দেবে কিন্তু তা সত্ত্বেও তার অনুজ্জ্বল গাত্রবর্ণ পাত্রপক্ষের অপছন্দের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। বিজ্ঞান, প্রযুক্তির দ্রুত উন্নয়নের যুগে মানুষের অসাধ্য বলে আজ আর কিছুই নেই। মানুষ সবদিক দিয়েই উন্নয়নের পথে বিচরণ করেছে কিন্তু তা সত্ত্বেও মানসিকতা

ও দৃষ্টিকোণের পরিবর্তন হয়নি। তাই বিয়ের বাজারে আজও মেয়েরা অপাঙক্তেয়। তাদের অবস্থার কথাই তুলে ধরেছেন আশালতা 'কালো মেয়ে' গল্পে। পাত্রপক্ষের কাছে বাহ্যিক দিকই বড় হয়ে দাঁড়ায়, তাই বিভিন্নগুণের অধিকারিণী হওয়া সত্ত্বেও পাত্রপক্ষ বিনাপ্রশ্নে খারিজ করে দেন অরুণাকে। মনে পড়ে কবিতা সিংহের 'আমি সেই মেয়েটি'র কথা—

"আমি সেই মেয়েটি
যে জন্মের থেকেই বিবাহের জন্য বলিপ্রদত্ত
যার বাইরের চেহারা
চোখ নাকমুখ চুল রং নিয়েই দর কষাকষি
কালো কিংবা ফরসা, টানা কিংবা টিকালো
লম্বা না বেঁটে, কুতকুতে না টানাটানি
যার মাথার বাইরেটা নিয়েই সবার ভাবনা
মাথার ভেতরটা নিয়ে কারো কোনো মাথা ব্যথা নেই।"
(আমি সেই মেয়েটা / কবিতা সিংহ)

অরুণা প্রথম থেকেই বুঝতে পারে তার গাত্রবর্ণের জন্য পাত্রপক্ষ তাকে পছন্দ করবে না তাই সে রমাকে বলে—

"আমার আর ব্যগ্র হয়ে কি হবে বল ভাই যা রঙ,
কেউ দেখে পছন্দ করবে না। শুধু শুধু মনকে চঞ্চল
করে লাভ কি?"[১৩]

অরুণাকে পাত্রপক্ষের পছন্দ হয় না। পরের দিন অরুণা স্কুলে গেলে শিক্ষয়িত্রী অনুযোগ করেন। অরুণার মুখ থেকে স্কুলে অনুপস্থিতির কারণ শুনে তিনি দুঃখিত হন, তার চোখ অশ্রুপূর্ণ হয়ে যায়। আশালতা অরুণার প্রতীকে বাঙালি পরিবারের শত-শত মেয়ের করুণকাহিনি তুলে ধরেছেন। পুরুষশাসিত

সমাজের এই অমানবিক আচরণবিধির বিরুদ্ধে আপত্তিজনক মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায় আশালতার গল্পে।

আশালতার গল্পসংকলন দ্বিতীয় খণ্ডের 'লগন বয়ে যায়' গল্পগ্রন্থের অন্তর্গত 'বদলে' গল্পটি। গল্পের বিষয়বস্তু হল বরপণ আর পাত্রীপরীক্ষা। 'বদলে' গল্পটি ২টি পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত। গল্পটিতে দেখা যায় 'কালোমেয়ে' গল্পের অরুণা থেকে রেখার অবস্থা আরো করুণ। রেখার বাবা লক্ষ্ণৌয়ে উঁচুপদে চাকরি করেন। তিনি রেখাকে বিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে কলকাতায় ছমাসের ছুটি নিয়ে আসেন। পাত্রপক্ষের কাছে নির্বাচিত হওয়ার জন্য সংস্কৃত শেখাতে পণ্ডিতমশাই নিযুক্ত করা হয়। রেখা পাত্রের বাবার পরীক্ষায় সফল হলেও পাত্র ও পাত্রের বন্ধুর বিভিন্ন প্রশ্নের যথাযোগ্য উত্তর দিতে না পারায় পাত্রপক্ষ পণের অংকটা বাড়িয়ে দেন। পাত্রপক্ষের মন মতো পণদানে অসমর্থ পিতা যখন চিন্তিত তখন রেখার মামা আরেকটি ধনীপাত্রের খোঁজ নিয়ে আসেন। এক্ষেত্রে পাত্রপক্ষের চাহিদা ইংরেজী শিক্ষিত ও ইংরেজি আদব কায়দা অভ্যস্ত পাত্রী। তাই পুরাতন সিলেবাসের বদলে নতুন সিলেবাস শেখানোর জন্য রাতারাতি নিযুক্ত করা হয় সংস্কৃত পণ্ডিতের বদলে মিস্‌ট্রিকি।

যোগ্যতা প্রমাণের পরীক্ষায় সিলেবাস পরিবর্তনে রেখা যে মানসিকভাবে প্রস্তুত নাও থাকতে পারে একথা কেউ ভাবেনি। উল্টে রেখার মা বলেন—

> *"কথায় বলে মেয়েমানুষের মন নয়তো যেন জল,*
> *যে পাত্তরে রাখবে তেমনই ধারা হবে" 'ওসব অদল*
> *বদলে কিছু যায় আসে না।"*[১৪]

পিতৃতন্ত্রের শেখানো বুলির বিরোধিতা করেছেন আশালতা আলোচ্য গল্পে। সমাজে মেয়েদের মতামতের যে কোনো মূল্য নেই, আশালতা রেখার মার উক্তির মধ্যদিয়ে তা স্পষ্টভাবে দেখিয়েছেন। 'কনে দেখা' গল্পের বিষয়বস্তুও

পাত্রীনির্বাচন। পাত্রীনির্বাচনের নামে মেয়েরা যে অপদস্থ ও অসম্মানের সম্মুখীন হয় আশালতা বিমলা চরিত্রটির মধ্য দিয়ে তা উপস্থাপন করেছেন। একদিন বিমলাকে দেখতে আসে পাত্রপক্ষ, বিমলাকে পাত্রের বন্ধুর প্রশ্ন ছিল—

> *"আপনি ক'রকম সেলাই জানেন? এম্‌ব্রয়ডারি, কাশ্মীর ষ্টিচ? ... পিক্‌টোগ্রাফ ? ... আচ্ছা বলুন দেখি মাছের কোপ্তা কেমন করে রাঁধে? মুড়ি ভাজতে জানেন? রাঁধাবাড়া বাটনা-বাটা এসব? ... ভাতের ফেন কেমন করে ঝরায় বলুন দেখি? ... আচ্ছা গান? গান কি এস্রাজ বাজিয়ে করেন, না হার্ম্মোনিয়াম?"*[১৫]

পাত্রের বন্ধুর প্রশ্নবাণে জর্জরিত গরীব ঘরের সন্তান বিমলা। এখনো বাঙালি সমাজে কনে দেখা বিষয়টি প্রহসন স্বরূপ। পাত্রী যাচাই করতে এসে পাত্রপক্ষ কখনও ভুলে যান কোন প্রশ্নটি করা প্রাসঙ্গিক আর কোনটি অপ্রাসঙ্গিক। গল্পের আরেকটি চরিত্র লীলাকে এ প্রসঙ্গে বিমলা বলে—

> *"বাংলাদেশে কনে-দেখা বস্তুটা কি রকম প্রহসনের ব্যাপার! মেয়েটিকে যাচাই করতে এসে জহুরি এক নিঃশ্বাসে প্রশ্ন করবেন, তুমি শেলী, কীটস, বায়রণ পড়েছ? ... তুমি ঘুঁটে দিতে পার? অথচ এর হাস্যকরতা, নিষ্ফলতা আর অসঙ্গতির দিকটা তাদের চোখে পড়ে না।"*[১৬]

এই উক্তিটি শুধু কি বিমলার? না বিমলার মতো বাঙালী পরিবারের শত-শত মেয়েদের। পাত্রী নির্বাচনের নামে কন্যাদের যে অপদস্থ করা হয় আশালতা বিমলার প্রতীকে তারই বিরোধিতা করেছেন। মিহির আচার্যের

'মনোনয়ন' গল্পেও পাত্রী নির্বাচনের নামে কন্যাদের যে অপদস্থ করা ও অসম্মানজনক পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়, তার বিরুদ্ধেই সচেতন প্রতিবাদ জানিয়েছেন গল্পকার স্বয়ং পাত্রীর মুখ দিয়ে। 'নারীর মূল্য' গল্পের তৃতীয় পরিচ্ছেদেও পাত্রী নির্বাচন বিষয়টি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। গল্পে দেখা যায় প্রত্যেকদিনের মতো সন্ধ্যায় কেদারবাবু ছাদে বসে দীর্ঘসময় ধরে শুনতে পেলেন প্রতিবেশী কোনো বালিকা-কণ্ঠের বেসুরো গান। গৃহিণীর কাছ থেকে জানতে পারলেন পাত্রপক্ষ বালিকাটিকে গান না জানার জন্যে অপছন্দ করে। তাই সে গান শেখার জন্য বদ্ধপরিকর। এ প্রসঙ্গে কেদারবাবুর মন্তব্য ছিল—

> *"আমাদের দেশের মেয়েদের ইহার বাড়া সমস্যা আর নাই। তাহার মূল্য যে কতখানি সে কথার চরমবিচার এই কষ্টি পাথরেই যাচাই হইবে। যাচাই হইবার আর কোন উপায়, কোন পথ নাই।"*[১৭]

কেদারবাবু গান শেখার পেছনের অজ্ঞাত কারণ জানতে পেরে মেয়েটির জন্য দুঃখ অনুভব করতে লাগলেন। তিনি বুঝতে পারলেন—

> *"এ শুধু তার কাছে গান নয়, জীবন-মরণের সমস্যা।"* [১৮]

আশালতা সিংহের প্রথম গল্প সংকলনের অন্তর্ভুক্ত 'অভিমান' গল্পগ্রন্থের 'অভিমান' নামে গল্পটিতেও পাত্রীনির্বাচন প্রসঙ্গ রয়েছে। গল্পটি 'উদয়ন' পত্রিকায়, বৈশাখ ১৩৪০এ প্রকাশিত হয়। গল্পটির শুরু অধ্যাপক কিরণের মেয়ে দেখাকে কেন্দ্র করে। অধ্যাপক কিরণ মায়ের অনুরোধে নিজের অনিচ্ছাসত্ত্বেও বন্ধু সতীশকে নিয়ে শ্যামবাজারে মেয়ে দেখতে যায়। প্রিয়দর্শন, বেনারসী পরিহিতা পাত্রী মায়াকে তার অপছন্দ হয়। মায়া তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও আত্মমর্যাদাসম্পন্না। কিরণের প্রত্যাখানে সে ভেতরে খুব দুঃখ পায়। মায়ার দুঃখ আরও বেড়ে যায় যখন

বিয়ের প্রস্তাব দেয় কিরণের বন্ধু সতীশ।

ঘটনাচক্রে অসুস্থ কাকার জলবদলের জন্যে মায়াকে কিরণের দেওঘরের বাড়িতে থাকতে হয়। সেসময় কিরণও ছুটি কাটাতে মাকে নিয়ে দেওঘরে যায়। প্রতিদিনকার মতো পাহাড়ে বেড়াতে গিয়ে হিল উঁচু জুতো পড়ে পাহাড়ে ওঠা অসম্ভব বলে জুতো খুলে উঠতে গিয়ে মায়ার পায়ের কুচি ফুটে প্রবলবেগে রক্তপাত হতে থাকে। সে সময় বেদনার্ত মায়ার চাহনিতে এমন কিছু ছিল যা কিরণের মায়ার প্রতি ভালোবাসার উন্মেষ ঘটে। কিরণ তখন মায়াকে বিয়ে করতে আগ্রহী হয়। অন্যদিকে দেখা যায় সতীশের মনোভাবের পরিবর্তন ঘটে। সে আর মায়াকে বিয়ে করতে চায় না। পুরুষপ্রধান সমাজে মেয়েদের পছন্দ-অপছন্দ, ইচ্ছা-অনিচ্ছার যে কোনো মূল্য নেই এখানেই রয়েছে তার যথার্থ প্রমান। মেয়েরা যে পণ্যদ্রব্যের মত, তাই আশালতার মনে হয়েছে—

"বাংলাদেশে মেয়ে দেখার ব্যাপারটাই এমন শাক,
মাছ, আলু কিনিবার মতো হইয়া দাঁড়াইয়াছে।"[১৯]

আশালতা মেয়ে দেখার সঙ্গে শাক-সব্জীর, মাছ কেনার প্রসঙ্গ এনে পুরুষশাসিত সমাজের পাত্রীনির্বাচন পদ্ধতির বিদ্রূপ করেছেন। পুরুষেরা ইচ্ছেনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেয়। এরফলে মেয়েদের মনোজগতে যে কি অবস্থা হতে পারে তার খবর কিন্তু কেউ রাখে না, কারণ তারা তো বস্তুবিশেষ, তাদের মন বলে কিছু নেই, কিছু থাকতেও নেই। আশালতা সিংহের পাত্রীনির্বাচন কেন্দ্রিক আরেকটি গল্প 'প্রশ্নপত্র'। গল্পটি দ্বিতীয় গল্পসংকলনের 'লগন বয়ে যায়' গল্পগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত। গল্পটিতে দেখা যায় অপূর্ব্বকুমার প্রতিজ্ঞা করেছেন গান-বাজনা জানা বিদুষী মেয়ে ছাড়া তিনি বিয়ে করবেন না। তাই পাত্রী নির্বাচন পরীক্ষায় বার-বার বিভিন্ন পাত্রীরা অনুত্তীর্ণ হওয়ায় তিনি পশ্চিমে যান পাত্রী দেখতে। সেখানে শোভনাকে দেখামাত্রই তার পছন্দ হয়ে যায়। অপূর্বের বন্ধু অখিল পাত্রী শোভনাকে

যখন বলেন—

> *"আপনি কি ধরনের গান ভালবাসেন? হাল্কা সুরের বাংলা গান না উচ্চাঙ্গের হিন্দুস্থানী সঙ্গীত? সঙ্গীতে আপনি সুরকেই বেশী প্রাধান্য দেন; না কথাকে? গানের আসল উদ্দেশ্য কি?"*[২০]

তখন শোভনার মুখে শোনা যায় ব্যঙ্গোক্তি—

> *"আমাকে কাগজ কলম দিন আমি উত্তর লিখি। অমনই সময় কতক্ষণ ও ফুলমার্ক কত তাও অনুগ্রহ করে জানাবেন।"*[২১]

আশালতা শোভনার উক্তির মধ্যদিয়ে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করেছেন পাত্রীনির্বাচন পদ্ধতির। উল্লেখ্য যে জ্যোতির্ময়ী দেবীর 'দর ও দস্তুর' নামে গল্পের নায়িকা নিভা পাত্রীনির্বাচন পদ্ধতিটির বিষয়ে জনে-জনে প্রশ্ন করে—

> *"চুল খুলে শাড়ি তুলে কনে-দেখা, সোনা যাচাই করা, টাকা পয়সা নিয়ে দরদাম করা এই সবের ভিতর দিয়ে সংঘটিত হচ্ছে প্রতিটি বিয়ে, সেই বিয়ের পর মেয়েটি তার স্বামীকে ভালোবাসতে পারে কীভাবে?"*

নিভার এই উক্তির মাধ্যমে আমাদের বুঝতে অসুবিধে হয়নি যে, সে আপত্তি জানায় পুরুষপ্রধান সমাজের এই অমানবিক ব্যবহারের বিরুদ্ধে। আশালতার দ্বিতীয় গল্প সংকলনের 'মধুচন্দ্রিকা' গল্পগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত 'নূতন প্রথা' গল্পে দেখা যায় পাত্রী-পরীক্ষার যে প্রথা প্রচলিত ছিল সেই প্রথার নবরূপায়ণ ঘটেছে তবে পাত্রীরা বিড়ম্বনা থেকে পরিত্রাণ পায়নি। 'নূতন প্রথা' গল্পটি মাসিক

বসুমতী পত্রিকায়, আশ্বিন ১৩৪৫ এ প্রকাশিত হয়। আলোচ্য গল্পে দেখা যায় আধুনিক, শিক্ষিতা, প্রিয়দর্শন উনিশ বছরের মুক্তির বিবাহের কথাবার্তা চলছে। একদিন মুক্তির মা উর্ম্মিলাদেবী ঘরে রেডিও শুনছেন এমন সময় ননীদি তার বড় মেয়ে উমা ও ননদ বিভাকে নিয়ে উপস্থিত হন। তার আসার কারণ হল তিনি তার মেয়েকে মিসেস হাতিয়ারের পার্টিতে নিয়ে যাবেন, উর্ম্মিলাও যাতে মুক্তিকে নিয়ে যান। পার্টিতে বড়লোকের ছেলেদের সমাগম ঘটবে তাই নিজেদের মেয়েদেরকে সাজিয়ে গুছিয়ে বাজারে ক্রেতার সামনে তুলে ধরাই ছিল উদ্দেশ্য, 'মেয়েরা বিয়ে বাজারে সেই পণ্যস্বরূপ', আশালতা 'নূতন প্রথা' গল্পে তাই দেখিয়েছেন। মুক্তি পার্টিতে গিয়ে দেখে বিজলী, শেফালী নিজেকে সেই বড়লোকের ছেলেদের সামনে জাহির করার জন্য নানা ধরনের কৌশল অবলম্বন করছে। মুক্তি শেফালীর মুখে যখন জানতে পায় অর্থনীতি তার প্রিয় বিষয়। তার কাছে কবিতা 'অসার ভাবালুতাপূর্ণ ন্যাকামী' আর উপন্যাস সে পড়ে না। তখন মুক্তির হাসি পায় কারণ ছোটবেলা থেকে সে শেফালীকে জানে। ডিটেকটিভ গল্পের বই, কবিতা ও উপন্যাস তার পাঠের বিষয়। সুযোগ্যপাত্রের মন জয় করার অভিপ্রায়ে সে মিথ্যার মুখোশ ধারণ করেছে। মুক্তির মনে প্রশ্ন জাগে, যে প্রশ্ন হয়ত বা লেখিকার নিজেরও—

> *"মেয়েমানুষকে কোন একজন পুরুষকে আকৃষ্ট করিতে হইলে সত্যই কি দরকার হয় এত মিথ্যার— এত হীনাচারের!"*[২২]

পার্টিতে গিয়ে মুক্তির মনে হয় নূতন প্রথার নামে সমাজে "ভিক্ষার নীরব ও সবর ব্যাকুলতা।" মেয়েরা মানসম্ভ্রমকে বিসর্জন দিয়ে যেন বলছে—

> *"ওগো আমায় নাও, আমায় নাও, দেখ আমার কত আছে; পরখ করে নাও, যাচাই করে নাও।"*[২৩]

মুক্তির এসব কিছুতে আপত্তি। তাই পার্টিতে দেবব্রত রায়ের মুক্তির উদ্দেশ্যে বলা উক্তিকে প্রত্যাখ্যান করে মুক্তি বলে—

"... আমার চোখের মধ্যে কি আলোর সন্ধান পেয়েছেন, তার অপরূপ তত্ত্ব শোনাবেন না।"[২৪]

মুক্তি বুঝতে পারে আসলে তার মন জয় করার জন্য কয়েকটি রোমান্টিক বুলি বলা ফন্দীমাত্র। মুক্তি প্রতিজ্ঞা করে—

"জীবনে কখনো বিয়ে করব না। অন্তঃত এ নূতন প্রথায় নয়।"[২৫]

এই উক্তির মধ্যেই রয়েছে প্রতিবাদী সুর। মেয়েদের বিয়ে ছাড়া জীবনের অন্য মানে নেই— পুরুষশাসিত সমাজের এই ধারণার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন আশালতা। মুক্তির প্রতীকে আশালতাকেই বলতে শোনা যায়—

"মেয়েরা লেখাপড়া শিখছে, গানবাজনা শিখছে, সাজসজ্জা করছে কেবল কি এইজন্যে।"[২৬]

বিয়ের বাইরেও মেয়েদের জীবনের অন্য মানে আছে আশালতার 'পরিবর্তন' উপন্যাসে মাধবীর মার কণ্ঠে তেমনি একটি কথা শোনা যায়—

"যখন ভালো পাত্র পাব, তখন বিয়ে দেব। তাই বলে কখন বিয়ে হবে সেই প্রতীক্ষায় দিন কাটিয়ে দেওয়াই কি ওর জীবনের উদ্দেশ্য? ওর নিজের জীবনের একটা মানে আছে।"[২৭]

'নূতন প্রথা' গল্পে আধুনিক ও শিক্ষিত সমাজের অন্তরালে নারী-পুরুষের মিথ্যার মুখোশের আড়ালের অন্তঃসারশূন্যতাকে শুধু তুলে ধরেছেন বললে ভুল

হবে তার বিরোধিতাও করেছেন আশালতা।

তৎকালীন সমাজে দুরারোগ্য ব্যাধির মতো সর্বস্তরে ছড়িয়ে পড়েছিল পণপ্রথা। এই পণপ্রথারূপী ব্যাধির প্রকোপে বাংলাদেশে অসহায়া কন্যা ও তার অভিভাবকদের দগ্ধ হতে হয়েছিল। সমাজসচেতন, মানবিকমূল্যবোধে বিশ্বাসী আশালতাকে এই ভয়ংকর বিষয়টি ভাবিয়েছে তাই তার গল্পে বিষয়রূপে ওঠে এসেছে 'পণ প্রথা'। আশালতা সিংহের 'বিনাপণের মর্যাদা' এক অন্যতম গল্প। আলোচ্য গল্পে পাত্রপক্ষের পণ আদায়ের এক নূতন ফন্দী সম্পর্কে আমাদের পরিচয় ঘটে। ভালোমানুষীর মুখোশধারী পাত্রপক্ষ নিজের লালসা চরিতার্থ করার অভিপ্রায়ে বিয়ের নামে কীভাবে কন্যাপক্ষকে শোষণ করে, আলোচ্য গল্পে আশালতা তাই দেখিয়েছেন। পাশাপাশি শিক্ষিত, ভদ্র, মুখোশধারী ব্যক্তিদের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ বাণে জর্জরিত করেছেন। শিবনাথ কেরাণীর চাকরি করেন। তাঁর স্ত্রী হলেন উচ্চশিক্ষিতা কমলাদেবী। চামেলী নামে তাদের একমাত্র মেয়েকে তাঁরা সুযোগ্যপাত্রের সঙ্গে বিয়ে দিতে চান। মেয়ে চামেলী রূপে, গুণে শিক্ষায় কোনদিক দিয়ে কম নয়। এর ফলে কমলাদেবীর মনে আশা ছিল তাদের মেয়েকে বিনাযৌতুকে বিয়ে দিতে পারবেন। চামেলীর জন্য গ্রামের শিক্ষিত যুবকের সম্বন্ধ এলে কমলাদেবী রাজী হলেন না। অজপাড়াগাঁয়ে অশিক্ষিত পরিবেশে তিনি চামেলীকে বিয়ে দিতে চান না। কারণ ব্যক্তিগত জীবনে যা কিছু থেকে তিনি বঞ্চিত ছিলেন তার কন্যা চামেলীর জীবনও এমনভাবে কেটে যাক তা তিনি মেনে নিতে পারেন নি। বিয়ের বাজারে যৌতুক ছাড়া যেখানে বিয়ে অসম্ভব সেখানে কমলাদেবীর খুড়তুতো বোন গায়ত্রী কন্যা শিপ্রাকে বিনা যৌতুকে বিয়ে দিচ্ছে জানতে পেরে পাকা দেখার নিমন্ত্রণ রক্ষা আর বিশেষ করে 'বিনাযৌতুকে' কিভাবে এই অসম্ভব ঘটনা সম্ভব হচ্ছে তা দেখার জন্য শিবনাথ সপরিবারে 'হাইসার্কেলের' গায়ত্রীদির বাড়ীতে উপস্থিত হন। সেখানে এসে কমলাদেবী ও শিবনাথের কাছে বিনাযৌতুকের বিয়ের রহস্য ক্রমশ আবিষ্কৃত হয়। ছেলের

বাড়ীর আভিজাত্য যাতে বজায় থাকে তারজন্য পাত্রপক্ষ মেয়ের সব অলংকার হীরের দিতে বলেছে। পাত্রপক্ষের মতে—

"ওঁদের যেমন ছেলে, ইচ্ছে করলে পঞ্চাশ হাজার টাকা গুণে নিতে পারতেন যে।"[২৮]

তাই পাত্রপক্ষের মান সম্মান রক্ষার জন্য পাত্রীপক্ষের কর্তব্য হীরের অলংকার দেওয়া। পাত্রপক্ষের নির্দিষ্ট ফার্নিচার ডিলারের কাছ থেকে ড্রইংরুম ও বেডরুমের আসবাব ক্রয় আর পাত্রপক্ষ নির্দ্ধারিত কাপড়ের দোকান থেকে বেয়াইয়ের কাপড়ের ফর্দ অনুযায়ী কাপড় কেনা হয়। এভাবে ধনীপাত্রের আভিজাত্য রক্ষার জন্য পাত্রপক্ষের সকল ইচ্ছাকে মেনে নেয় পাত্রীপক্ষ। সেখান থেকে ফিরে এসে কমলাদেবী বিনাযৌতুকের বিয়ের রহস্য বুঝতে পেরে কন্যাকে গ্রামের শিক্ষিত যুবকের সঙ্গে বিয়ে দেন। যৌতুকরূপী রাক্ষসের করাল গ্রাসে শত-শত মেয়েদের জীবন তছনছ হয়ে পড়ে। সরসীবালা বসুর 'আহুতি' উপন্যাসে দেখা যায় পণপ্রথার জন্য চৌদ্দবছরের মেয়ে গায়ে আগুন জ্বালিয়ে সংসার থেকে বিদায় নেয়। আশালতা 'বিনাপণের মর্য্যাদা' গল্পের মধ্যদিয়ে বিরোধিতা করেছেন সেই শিক্ষিত, ভদ্র মুখোশধারী ব্যক্তিদের যারা একবারও পাত্রীপক্ষের সামর্থ্যের কথা না ভেবে কৌশলে জিনিষপত্র আদায় করে নেয়। কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮৬৩-১৯৪৯) 'মধুরেণ' গল্পটিও একটি পণপ্রথা বিরোধী প্রতিবাদী গল্প। এখানে লেখক নায়িকা শৈলের মধ্যদিয়ে বিরোধিতা করেছেন পণ-লোলুপ সমাজকে। এছাড়া রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'দেনা পাওনা', 'হৈমন্তী', 'অপরিচিতা' গল্পে, জগদীশ গুপ্তের 'পয়োমুখম্' গল্পেও পণপ্রথা বিরোধী মানসিকতার পরিচয় রয়েছে।

তৎকালীন সমাজে জন্মসংক্রান্ত বিষয়ে কন্যা সন্তান অপেক্ষা পুত্র সন্তানই অভিপ্রেত ছিল। পুত্রের মাকে সে সময় বিশেষ মর্যাদা দেওয়া হত। অন্যদিকে

কন্যার মার কপালে জুটত নানা অবহেলা। কন্যার মাকে এমন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হত, সে যেন কন্যা জন্ম দিয়ে সমস্ত বড় কোনো অন্যায় করেছে। কখনও দেখা যেত শ্বশুরালয়ের একান্ত আগ্রহে নিজের অনিচ্ছা সত্ত্বেও পুত্রসন্তানের জন্য বারবার সন্তান ধারণ করতে হচ্ছে। পুরুষপ্রধান সমাজে পুত্র ও কন্যাকে ভিন্ন চোখে দেখা, তাদের প্রতি ভিন্ন আচরণ করা, আশালতা সেই সংকীর্ণ মানসিকতার বিরোধিতা করেছেন 'নারীর মূল্য' গল্পে। গল্পটির শুরুতেই দেখা যায় নীরজা নামে বধূটি কন্যাসন্তান জন্ম দেওয়ায় স্বামী অসন্তুষ্ট হয় সেইসঙ্গে শাশুড়ির খোঁটাও সহ্য করতে হয়। অনিচ্ছাসত্ত্বেও নীরজাকে শ্বশুরালয়ের একান্ত ইচ্ছেকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে বারবার সন্তান ধারণ করতে হয়েছে। এ প্রসঙ্গে মনে আসে আশাপূর্ণা দেবীর 'সুবর্ণলতা' উপন্যাসেরও। সুবর্ণ একান্ত অনিচ্ছায় বারবার সন্তান ধারণ করেছে। তার 'নারীর মূল্য' গল্পে নীরজার তিনটি কন্যা সন্তানের পর পুত্র সন্তানের আগমনে পরিবারের সকলের আনন্দের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। এসব ঘটে বামুনদের গিনি দিয়ে প্রণাম করার মধ্য দিয়ে। এসব দেখে পাশের বাড়ির গৃহিনী তার স্বামীকে বলেন—

> *"বাঙালী ঘরে ছেলেতে-মেয়েতে এতই পার্থক্য! আকাশ-পাতাল ব্যবধান। ছেলে হইলে সবারই মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিবে, ঘন-ঘন শাঁখ বাজিবে। আর মেয়ে দৈবক্রমে জন্মাইল, জননী নিজেকে মনে করিবেন অপরাধী, পরিজনের কাছে তাঁহার মাথা হেঁট হইবে। নবজাতা অতিথিটির জন্য মানব-সংসারে কোথাও কোন অভ্যর্থনা কোন সম্মানের আয়োজন হইবে না।"*[২৯]

গৃহিনীর এ বক্তব্যের মধ্যদিয়ে আশালতা বাঙালি সমাজে পুত্র-কন্যার পার্থক্যের ছবি তুলে ধরে সমাজের এই সংকীর্ণ মানসিকতার বিরোধিতা করেছেন।

পুত্রসন্তান জন্মের পর পরিবারের লোকেরা সকলেই আনন্দিত হয়ে তার আগমনে শাঁখ বাজান। কথায়ই তো আছে, পুয়ার যশ সাথে, পুরির যশ হাতে। মেয়ে সন্তানকে এ পৃথিবীতে অভ্যর্থনা জানানো হয় আতুড়ঘরের দরজায় লাথি মেরে। নীরজা পুরুষশাসিত সমাজের এই অমানবিক আচরণের বিরুদ্ধে অভিমানে মুখ ফিরিয়ে শুয়ে থাকে। মেয়েটি চাপা পড়বে ভেবে দাই যখন পাশ ফিরতে বলে তখন দুঃখে-অভিমানে কান্নাসুরে হৃদয়-বিদারক একটি উক্তি মুখ থেকে বেরিয়ে আসে নীরজার—

"পিঠই লাগুক আর পাটই লাগুক, মেয়ের মুখ আর
যেন আমাকে দেখতে না-হয়, এই আশীর্ব্বাদ ক'রো
দিদি।"[৩০]

নীরজার এই প্রার্থনার মধ্যে কত দুঃখই যে লুকিয়ে রয়েছে তা সহজেই বোধগম্য। কবিতা সিংহের 'ভ্রূণা' কবিতাটির মধ্যেও রয়েছে একটি মেয়ের অভিমান ভরা কণ্ঠস্বর—

"আমরা ভ্রূণ না ভ্রূণা
জন্ম দিও না মা!
মা আমার জেনে শুনে কখনো উদরে
ধরো না এ বৃথা মাংস
অযাচিত কখনো ধরো না।
আর ভয় নেই কোনো ভয়
যত গর্ভবতী ভাঙো শোক
নিশ্চিন্ত হোক সর্বলোক
হলুদ-বসন্ত পাখি ডাকুক নির্ভীক স্বরে হোক
গেরস্তের ঘরে ঘরে

খোকা হোক! খোকা হোক! শুধু খোকা হোক!"[৩১]

আশালতার মতো স্বর্ণকুমারী দেবী ও প্রাবন্ধিক কৃষ্ণভাবিনী দাসী এবং তাঁদের উত্তরকালের রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেনও সমাজে প্রচলিত নারী-পুরুষের বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন, সমাজে নারী-পুরুষের সমানাধিকারের দাবি তুলেছিলেন। রোকেয়া বলেছিলেন—

"একটা পরিবারে পুত্র ও কন্যায় যে প্রকার সমকক্ষতা
থাকা উচিত, আমরা তাহাই চাই।'[৩২]

কিন্তু সব চাহিদারই কি যথার্থ মূল্য দেওয়া হয়েছে? তাই তো আশালতার 'নারীর মূল্য' গল্পে দেখা যায় মেয়েরা আই-এ, বি-এ পড়ছে বা পড়ার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। যথোপযুক্ত পাত্র পাওয়া যাচ্ছে না বলেই—

"মেয়েদের আমরা দায়ে পড়ে অনেকটা পড়াচ্ছি।
ভালো বর কোথা? আমাদের সমাজের অধিকাংশ
ভাল ছেলেই আজ জেলে। যারা বাইরে আছে,
তাদের মধ্যেও বড় সরকারী চাকুরে খুব কম।"[৩৩]

আমাদের সমাজব্যবস্থায় কন্যা সন্তান শৈশব থেকে কৈশোরে পা দেওয়া মাত্রেই তাদের বিয়ে দেওয়া পরিবারের একমাত্র লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়। তাদের কাছে বিবাহেই যেন মেয়েদের জীবনের একমাত্র সার্থকতা। আশালতা 'নারীর মূল্য' গল্পের এই পরিচ্ছেদের মাধ্যমে সমাজের এই সংকীর্ণ মানসিকতার বিরোধিতা করেছেন।

পুরুষশাসিত সমাজে নারীর ওপর হওয়া সমস্ত অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে যেমন আশালতা কলম ধরেছেন তেমনি ব্যক্তি পুরুষের নারীর ওপর করা অন্যায়ের বিরুদ্ধেও কলম ধরতে দেখা যায় আশালতাকে। 'উমার তপস্যা' গল্পটিতে দেখা

যায় নায়িকা অমিতা শিক্ষিতা, প্রিয়দর্শন, সঙ্গীতে পারদর্শী। তার বিয়ে হয় সমরেশ রায়ের সঙ্গে। শিবপত্নী উমা যেভাবে তার স্বামীর ছবি কল্পনায় অংকিত করেছিলেন ঠিক তেমনি অমিতাও তার ভবিষ্যত স্বামীর চিত্র কল্পনায় অংকন করেছে কিন্তু বাস্তবের স্বামী সমরেশের সঙ্গে কল্পনার সমরেশের আকাশ-পাতাল পার্থক্য। তাই স্বামীর মুখদর্শনের পরে অমিতার মনে হয়েছিল—

> *"অসম ছন্দ। তার জীবনের ছন্দের সংগে এ মুখের ছন্দের কোথা এতটুকু মিল নেই।'*[৩৪]

বিবাহে সমতা বিচারের মাপকাঠি শুধু বয়স নয়। অসমতা আসতে পারে রুচি, সামাজিক পরিস্থিতির বিচারেও। এ প্রসঙ্গে মনে আসে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'যোগাযোগ' উপন্যাসে কুমুদিনী ও মধুসূদনের কথা। অমিতার ক্ষেত্রেও সমরেশের সঙ্গে অমিল লক্ষ্য করা যায় রুচির বিষয়ে। বিয়ের জন্য সুপাত্রের নির্বাচন করতে গিয়ে পাত্র বিদ্বান ও উপার্জনশীল কিনা তা দেখেই বিয়ে দেওয়া হয় কিন্তু তার রুচি, চিন্তাধারা এসব তো কেউ লক্ষ্য রাখে না। আশাপূর্ণা দেবীর উপন্যাসে সুবর্ণ পারুলের বিয়ের পর ভাবত—

> *"বিদ্বান আর রোজগারি, কুলীন আর বনেদি ঘর, এই তো সুপাত্রের হিসেব, এই দেখেই তো বিয়ে দেওয়া। কে কবে দেখতে চায় তার রুচি কী, চিন্তা কী, জীবনের লক্ষ্য কী?*
>
> *দেখতে যায় না বলেই এত অমিল! তলায় তলায় এত কান্না।"*[৩৫]

বাসররাত্রে সমরেশ যখন জানতে চায় অমিতার প্রিয় কি? তখন উত্তরে অমিতা জানায় গান গাওয়া, রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও টলষ্টয়ের উপন্যাস পড়া

তার অত্যন্ত প্রিয়। উত্তর শুনে সমরেশ রাগান্বিত হয়ে বলে—

"কিন্তু শুধু গান গেয়ে আর টলষ্টয় পড়ে তো সংসার চলে না। ...এবার ওসব ভুলতে হবে।"[৩৬]

এছাড়া যখন অমিতার হাতে টলষ্টয়ের 'অ্যানা ক্যারেনিনা' দেখতে পায় তখন সমরেশ তাঁর হাত থেকে কেড়ে নিয়ে বলে উঠে—

"দেখ, এখন থেকে তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি, এসব বই তোমার পড়া চলবে না। ...কখনো ভুলো না যেন বিপদ হবে তাহলে।"[৩৭]

নারী প্রতিভা নষ্ট করে দিতে পুরুষতন্ত্র সর্বদা সচেষ্ট। রবীন্দ্রনাথের 'খাতা' গল্প, আশাপূর্ণার 'সুবর্ণলতা' এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। নারীর প্রতিভাকে রান্নাঘর এবং সংসারের গন্ডীর মধ্যেই রাখতে অধিকাংশ পুরুষ আগ্রহী। পুরুষ নিজের ইচ্ছা ও পছন্দকে চাপিয়ে দেন স্ত্রীর ওপর। যদি কোনো স্ত্রী স্বামীর ইচ্ছা ও পছন্দ মানতে না চায় তবে সেই স্ত্রীকে হতে হয় স্বামীর ক্রোধের শিকার। স্ত্রীদেরও নিজস্ব পছন্দ-অপছন্দ, ইচ্ছা-অনিচ্ছা থাকতে পারে এটা তাদের কাছে অভাবনীয়। আশালতা 'উমার তপস্যা', 'রান্নাঘর' প্রভৃতি গল্পের মাধ্যমে সে-সব পুরুষদের সংকীর্ণ মানসিকতার বিরোধিতা করেছেন, যারা তাদের স্ত্রীদের শুধু রান্নাঘরের গন্ডীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখতে চান, যাদের ধারণা এর বাইরে মেয়েদের কিছু করার ও জানার নেই। 'রান্নাঘর' গল্পে দেখা যায় সুধীরার ছোট সংসার। তা সত্ত্বেও অধিকাংশ সময় রান্নাঘরের নিরন্তর কর্মব্যস্ততায় সুধীরার সময় অতিবাহিত হয়। রান্নাঘরে দু'জন দাঁড়াবার পাশাপাশি জায়গা নেই, সারাদিন কয়লার চুল্লি দুটো জ্বলতে থাকে। খাদ্যবিলাসী দোর্দন্ডপ্রতাপ স্বামী রমেশের দেরী হয়ে যাচ্ছে দেখে তাড়াতাড়ি করে রান্না করতে গিয়ে কয়লার আগুনে সুধীরার মুখমন্ডল লাল হয়ে ওঠে। রমেশকে খবরের কাগজ পড়তে দেখে

সুধীরা উৎসুক চিত্তে কাগজে কী ঘটনা রয়েছে জানতে চাইলে রমেশ কর্কশ স্বরে বলে উঠল—

> *"তাতে তোমার কি? কাগজের ভাবনা রেখে এমন হাত চালিয়ে রান্নাটা সেরে নাও দেখি বেলা কত হলো সে খেয়াল আছে?"*[৩৮]

রমেশ চরিত্রের প্রতীকে আশালতা সে-সব স্বামীদের চরিত্রকে উপস্থাপন করেছেন যারা ভাবে স্ত্রীদের অন্তঃপুরের গৃহকর্ম ছাড়া তাদের আর কিছু করার ও জানার নেই। এমন কি তারা নারীদেরকে অন্তঃপুরের কোণ ছাড়া বহির্জগতে দেখতে চায় না। সেই অন্তঃপুরের কোণে বউদের প্রতিপদেই অপরাধী, দোষী করে রাখা হয়। 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকার একটি চিঠিতে 'কোণের বউদের' জীবনযাপনের ছবি লক্ষ্য করার মত—

> *"বঙ্গদেশে একজাতি মনুষ্য আছে, তাহাদিগকে কোণের বউ বলে। কোণের বউ হওয়া যে কি ভয়ানক দায়, তাহা যাঁহারা কোণের বউ তাঁহারাই জানেন, যাঁহারা সরলচিত্তে তাহা অনুভব করিয়া থাকেন, তাঁহারাই বুঝিতে পারেন। কোণের বউ প্রতিপদেই অপরাধী, প্রতিকার্যেই দোষী। গমনে, ভোজনে, রন্ধনে, বাক্য-কথনে, অঙ্গচালনে, সকলেতেই কোণের বউ দোষী।'*[৩৯]

কোণে বউ সুধীরার স্বামীর জন্য রান্না ও স্বামীর নিমন্ত্রিতদের জন্য রান্নার আয়োজন করতে করতেই সারাদিন কেটে যায়। পুরুষশাসিত সমাজে গৃহিনীদের এই অবস্থা অবলোকন করে মিসেস রহমান বলেছেন—

> *"তোমরা তাদের সহধর্মিনী, গৃহিনী, সঙ্গিনী, সন্তানের*

মাতা না নির্বিবাদে লাঞ্ছনা, গঞ্জনা, লাথি, ঝাঁটা ও সময়শীরে পাতের মাছটুকু, দুধটুকু পাবার প্রত্যাশী পোষা কুকুর বিড়াল বিশেষ? না প্রমোদের সঙ্গিনী?"[৪০]

আশালতা সুধীরার প্রতীকে শত-শত মেয়েদের জীবন বৃত্তান্তকে তুলে ধরেছেন যারা 'রান্নার পরে খাওয়া আর খাওয়ার পরে রান্নার' চক্রাবর্তনের মধ্যেই যাদের জীবন অতিবাহিত। পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় নারীদের অন্তরের অভিযোগের ভাষা 'নীরবে নিভৃতে কাঁদে' তাই বুক ফাটে তো মুখ ফোটে না। নারী এই মর্মান্তিক ও শোচনীয় পরিস্থিতি থেকে মুক্তি পেয়ে নিজের এক স্বতন্ত্র পরিচয় গড়ে তোলার অধিকার কখনও কি পাবেনা? এমন এক প্রশ্নের উত্তর জানতে চেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ—

"নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার
কেন নাহি দিবে অধিকার...।"

আর আশালতার ছোটগল্পেও রয়েছে একই সুর। তাই তাঁর লিখিত গল্পে বারবার নজরে পড়ে নারীর 'আত্মানুসন্ধান' এবং 'স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াই-এর বিচিত্র বয়ান'।

বোভোয়া তো বলেছেন— *'সমাজই মানুষকে নারী করে তোলে'*। ঊষাপ্রভা নারীর দুরাবস্থাকে কেন্দ্র করে 'নারীর অবস্থা' প্রবন্ধে লিখেছেন—

"নারীকে পুরুষ ভোগের জন্য বিলাসিনী, সংসার ও সুবিধার জন্য দাসী করিয়া রাখিয়াছে, জ্ঞানে শিক্ষায় আপনার সমকক্ষ করে নাই।"[৪১]

পুরুষতান্ত্রিক সমাজে মেয়েদের প্রথম পরিচয় সে মেয়ে, তারপর তার

পরিচয় সে মানুষ। অর্থাৎ আগে মেয়ে পরে মানুষ। 'মেয়েমানুষ' বলে তাদের বিচারশক্তি ও বুদ্ধি কম এমন কথাও বলা হয়। এ প্রসঙ্গে মনে আসে বঙ্কিমচন্দ্রের তির্যক উক্তি— *"স্ত্রীলোকের বুদ্ধি কম ও আধখানা বৈ পুরা দেখিতে পাইলাম না।"* এরকম ভাবনা আছে গারো সমাজেও—

> ***"Do nok wagam gri, Mechik Gisik Gri,***
> *অর্থাৎ একটি মুরগীর যেমন দাঁত থাকে না,*
> *মেয়েদেরও তেমনি কোনো মগজ থাকে না।"*[৪২]

আমাদের সমাজ মেয়েদের সম্পর্কে যে ভাবনা পোষণ করে আশালতা 'মেয়েমানুষ' গল্পের মধ্যদিয়ে সেই সংকীর্ণ মানসিকতার বিরোধিতা করেছেন। 'মেয়েমানুষ' গল্পে আই.ই পাশ ললিতার বিয়ে হয় এক সম্ভ্রান্ত জমিদার পরিবারে। বিয়ের পর শ্বশুর ও নন্দাই-এর কথাবার্তায় সে বুঝতে পারে মেয়েদের প্রতি পরিবারের মানসিকতা। বিয়ের পরে বউভাতের নিমন্ত্রণকেন্দ্রিক আলোচনায় যখন শাশুড়ি ও শ্বশুরের মধ্যে কথাবার্তা হয় তখন ললিতা ছাদে দাঁড়িয়ে শ্বশুরকে শাশুড়ির উদ্দেশ্যে বলতে শুনে—

> *"তুমি মেয়েমানুষ, মেয়েমানুষের মত থাকা তোমার*
> *এসব কথায় থাকবার দরকার কি? আর বোঝই বা*
> *তুমি কি?"*[৪৩]

অন্যত্রও একই কথার পুণরাবৃত্তি শুনতে পাওয়া যায় নন্দাই-এর কণ্ঠে—

> *"কে বলেছিল সর্দারি করে তোমাকে কাপড় আনতে।*
> *জান আমি পঁয়তাল্লিশ ইঞ্চি ছাড়া কাপড় পরিনে।*
> *এই চুয়াল্লিশ ইঞ্চি ঠোঁটি কাপড় নিয়ে আমি করব*
> *কি? মেয়েমানুষ আছ, মেয়েমানুষের মত থাকলেই*
> *তো পার, মোড়লি করতে আস কেন?"*[৪৪]

ললিতা যখন ছাদ থেকে ফিরে তার ঘরে আসে তখন তার স্বামী তাকে বলেন, "কেমন লাগছে তোমার এখানে?"

একথার প্রত্যুত্তরে ললিতার মুখ থেকে বেরিয়ে আসে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ—

> *"বেশ লাগছে। আমি যে আর কিছু নই মেয়ে মানুষ মাত্র, সে তত্ত্বটি হৃদয়ঙ্গম করছি।"*[৪৫]

আশালতা ললিতার প্রত্যুত্তরের মধ্যদিয়ে সমাজের সংকীর্ণ মানসিকতার বিরুদ্ধে শ্লেষাত্মক উক্তি করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারী পুরুষের বৈষম্যের বিরোধিতা করে 'সাম্য' প্রবন্ধে লিখেছিলেন—

"এখানে রমণী পিঞ্জরাবদ্ধ বিহঙ্গনী যে বুলি পড়াইবে, সেই বুলি পড়িবে।"

এছাড়া সমাজে প্রচলিত নিয়মনীতির প্রতিবাদ করে লিখেছিলেন—

> *"পুরুষের যত প্রকার দৌরাত্ম আছে, স্ত্রী পুরুষের যত প্রকার বৈষম্য আছে, তন্নধ্যে ... স্ত্রীগণকে গৃহমধ্যে বন্য পশুর ন্যায় বদ্ধ রাখার অপেক্ষা নিষ্ঠুর; জঘন্য অধর্মপ্রসূত বৈষম্য আর কিছুই নাই। আমরা চাতকের ন্যায় স্বর্গমর্ত্য বিচরণ করিব। কিন্তু ইহারা দেড় কাঠা ভূমির মধ্যে, পিঞ্জরে রক্ষিতার ন্যায় বদ্ধ থাকিবে। পৃথিবীর আনন্দ, ভোগ, শিক্ষা, কৌতুক, যাহা কিছু জগতে ভালো আছে, তাহার অধিকাংশে বঞ্চিত থাকিবে! কেন? হুকুম পুরুষের।"*[৪৬]

পুরুষতান্ত্রিক সমাজে মেয়েদের মতামতের যে কোনো মূল্য নেই। একথাটির যথার্থ প্রমাণ পাওয়া যায় 'মেয়েমানুষ' গল্পের পনেরো বছরের আনুকে দিয়ে। পনেরো বছরের আনুর বিয়ে ঠিক হয়েছে পঞ্চাশের কাছাকাছি পাত্রের

সঙ্গে। আনু এই বিবাহে অনিচ্ছুক তথাপি তার অভিভাবকরা এই পাত্রের সঙ্গে বিয়ে দিতে প্রস্তুত। এমনকি প্রতিবেশিনীরাও এ বিষয়ে সম্মতি প্রকাশ করে বলেছেন— "তা বেশ হয়েছে আনুর মা।" মেয়েদের সময়মতো বিয়ে দিতে না পারায় এক ঘরে হওয়ার ভয়ে বা পুণ্যলাভের আশায় কন্যাপক্ষরা কন্যাকে বিয়ে দেওয়ার অভিলাষে মেয়ের ইচ্ছা-অনিচ্ছার দিকে লক্ষ্য না রেখে যথার্থভাবে পাত্র নির্বাচন না করে অযোগ্য পাত্রের সঙ্গে বৈবাহিক বন্ধনে বেঁধে দেন। ফলে সামাজিক যূপকাষ্ঠে এভাবে শত-শত মেয়েদের স্বপ্ন, স্পৃহা, জীবন প্রতিনিয়ত বলি হয়। এ অংশে সে সব অভিভাবকদের বিরুদ্ধে আশালতার আপত্তিজনক মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়।

'ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়্যাল' গল্পে আশালতা মিনতি নামে নারী চরিত্রটির অবতারণা করে নারীর প্রতি পুরুষশাসিত সমাজের দৃষ্টিকোণের বিরোধিতা করেছেন। 'ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়্যাল' গল্পে দেখা যায় নীরেন, সীতাংশু, সত্যেন নামে তিন বন্ধু সাহিত্য, শিল্প, গানবাজনা ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করতে পছন্দ করে। সীতাংশু একজন ঔপন্যাসিক। কোনো এক শুক্রবার সীতাংশুর বাড়িতে গানের জলসায় নীরেনের গান শুনে মুগ্ধ হয়ে পুষ্পলতা যার অপর নাম মিনতি সে গানের মূল্যায়ণ করে নীরেনের কাছে তার বাড়ীর ঠিকানায় চিঠি পাঠায়। মিনতি শিক্ষিতা, গান, সাহিত্য ইত্যাদি সকল বিষয়ে অভিজ্ঞ। নীরেন ও সীতাংশু দিদি ছায়ার বাড়ীতে মধ্যাহ্ন ভোজনের দিনই জানতে পারে মিনতিই পুষ্পলতা। সেদিন ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়্যাল হল থেকে ফিরে এসে নীরেন যখন শোনে মিনতি সেদিনই বাবার সঙ্গে রাত ট্রেনে বাড়ী ফিরবে ও কলকাতার শহরের বড় সম্ভ্রান্ত পরিবারে তার বিয়ে ঠিক হয়েছে তখন নীরেনের মনে প্রশ্ন জাগে। যুগ পরিবর্তন হলেও মানসিকতা রয়েছে অপরিবর্তিত, তাই আশ্চর্য হয় এই ভেবে যে নারীর বিয়ের দিন স্থির হয়েছে ২৮শে ফাল্গুন সে কেন কোনো পুরুষের সঙ্গীতের প্রশংসা করে চিঠি লিখে পাঠাবে। এভাবনা নিঃসন্দেহে

‘পুরুষশাসিত রক্ষণশীলতারই’ পরিচায়ক। নারীরা যে পুরুষের মতো সর্বগুণের অধিকারিণী হয়ে উঠতে পারে এবোধ নীরেন ও সীতাংশুর মতো অনেক পুরুষই মেনে নিতে চান না। আশালতার সে সব পুরুষের বিরুদ্ধে তাদের মানসিকতার বিরুদ্ধে ছিল প্রতিবাদ।

‘পূর্ব্বাপর’ গল্পেও দেখা যায় আধুনিকভাবাপন্ন রজতের বিশ্বাস মেয়েরা বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, প্রতিভায় পুরুষের সমকক্ষ। সে দেখেছে মেয়েরা সৈনিক হচ্ছে। এরোপ্লেন চালাচ্ছে। কামান দাগ্‌ছে। অন্তঃপুরের কারাগারে বোরখা পরিয়ে মেয়েদের বন্দী করে রাখার দিন শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু নমিতার সঙ্গে বিয়ের পর প্রগতিশীল উদার মনোভাবাপন্ন রজত কোথায় হারিয়ে যায়। বিবাহ পূর্ববর্তী রজতের সঙ্গে বিবাহ পরবর্তী রজতের মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। এমনকি বাড়ির মধ্যে রাস্তার ধারে বারান্দায় দাঁড়িয়ে নমিতার হাওয়া খাওয়াটাও তার কাছে অপ্রীতিকর মনে হয়। আশালতা এই গল্পের মাধ্যমে বলতে চেয়েছেন রজতের মতো উচ্চশিক্ষিত পুরুষেরা যতই নারীর স্বাধীনতা ও অধিকার নিয়ে বিতর্ক করুণ না কেন, বাস্তব জীবনে নিজের ক্ষেত্রে সেই আজন্ম লালিত ভাবনাই মনের মধ্যে লালন করে। আশালতা রজতের মধ্য দিয়ে সে সব পুরুষের বিরোধিতা করেছেন আশালতা।

আশালতা চাইতেন এমন এক সমাজ, যেখানে নারী-পুরুষের সমমর্যাদা, সমানাধিকার থাকবে। তাই তাঁর গল্পের বয়ানে বারবার উঠে আসে পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারী-পুরুষের বিভেদগত সমস্যা অর্থাৎ লিঙ্গ বৈষম্যের দিকটি। আশালতা মোটেও পুরুষ বিদ্বেষী নন, কিন্তু পুরুষতন্ত্রের চাপিয়ে দেওয়া অন্যায় নিয়মনীতি বা আচরণবিধিকে মেনে নেওয়াতে তাঁর ছিল ঘোর আপত্তি। তাই সব সময়ই পুরুষতন্ত্রের অন্যায় নিয়মনীতি বা আচরণবিধির বিরোধিতা করতে দেখা গেছে তাঁর গল্প-উপন্যাসে।

উল্লেখসূত্র :

১. ঐতিহ্যের প্রেক্ষাপটে রবীন্দ্রনাথের গল্পে নারী স্বাধীনতা প্রসঙ্গ, প্রশান্ত মুখোপাধ্যায়, প্রথম প্রকাশ- বইমেলা জানুয়ারী ২০০৮, পৃঃ ৩২

২. স্মৃতিচন্দ্রিকা, সংস্কারকাণ্ড, মহীশূর সংস্করণ, পৃঃ ৬২

৩. দ্র. ঐতিহ্যের প্রেক্ষাপটে রবীন্দ্রনাথের গল্পে নারী স্বাধীনতা প্রসঙ্গ, পৃঃ ৩২

৪. দ্র. ঐ. পৃঃ ৩২

৫. সুকুমারী ভট্টাচার্য, প্রাচীন ভারত সমাজ ও সাহিত্য, আনন্দ পাবলিশার্স, প্রথম সংস্করণ— আষাঢ়, ১৩৯৪, পৃঃ ৩৮

৬. শতপথ ব্রাহ্মণ ৪/৪/২/১৩

৭. শতপথ ব্রাহ্মণ ১৪/১/১/৩১

৮. বৈদিক সংহিতা নারী, নবপত্র, পরাগরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, ১৯৯৫, পৃঃ ৩০

৯. মনুসংহিতা ৩/৫৫-৫৬

১০. মুরারিমোহন সেনশাস্ত্রী অনূদিত মনুসংহিতা, পৃঃ ৩৭৫

১১. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : বঙ্কিম রচনাবলী (মডেল পাবলিশিং হাউস) ১৯৮২, 'বঙ্গদেশের কৃষক', পৃঃ ১৪৩

১২. আশালতা সিংহের গল্প সংকলন-২, সংকলন- অভিজিৎ সেন ও অনিন্দিতা ভাদুড়ী, প্রথম প্রকাশ- জুন ২০০৭, পৃঃ ৩২৩

১৩. দ্র. আশালতা সিংহের গল্প সংকলন-২, পৃঃ ৩২৩

১৪. দ্র. ঐ, পৃঃ ১২১

১৫. দ্র. ঐ, পৃঃ ১৭৩

১৬. দ্র. ঐ, পৃঃ ১৭৩

১৭. দ্র. ঐ, পৃঃ ২৬৫

১৮. দ্র. ঐ, পৃঃ ২৬৫

১৯. আশালতা সিংহের গল্প সংকলন-১, সংকলন- অভিজিৎ সেন ও অনিন্দিতা ভাদুড়ী, প্রথম প্রকাশ- এপ্রিল ২০০৬, পৃঃ ৭৮

২০. দ্র. আশালতা সিংহের গল্প সংকলন-২, পৃঃ ১১৫

২১. দ্র. ঐ, পৃঃ ১১৬

২২. দ্র. ঐ, পৃঃ ২৩৫

২৩. দ্র. ঐ, পৃঃ ২৩৭

২৪. দ্র. ঐ, পৃঃ ২৩৭

২৫. দ্র. ঐ, পৃঃ ২৩৭

২৬. দ্র. ঐ, পৃঃ ২৩৭

২৭. আশালতা সিংহ, পরিবর্তন, আশালতা সিংহ রচনাবলী, পৃঃ ২০২

২৮. দ্র. আশালতা সিংহের গল্প সংকলন-২, পৃঃ ২০০

২৯. দ্র. ঐ, পৃঃ ২৬২

৩০. দ্র. আশালতা সিংহের গল্প সংকলন-২, পৃঃ ২৬২

৩১. কবিতা সিংহ : শ্রেষ্ঠ কবিতা, দে'জ পাবলিশিং, তৃতীয় সংস্করণ, এপ্রিল ২০০৯, পৃঃ ১২৪

৩২. রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেন, 'স্ত্রীজাতির অবনতি' মতিচূর (প্রথম খণ্ড) , রোকেয়া রচনাবলী ২০০১, কলকাতা, পৃঃ ২৫

৩৩. দ্র. আশালতা সিংহের গল্প সংকলন-২, পৃঃ ২৬৩

৩৪. দ্র. ঐ, পৃঃ ৪২৩

৩৫. আশাপূর্ণা দেবী— সুবর্ণলতা, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ, চৈত্র, ১৩৭৩, পৃঃ ৩২১

৩৬. দ্র. ঐ, পৃঃ ৪২২

৩৭. দ্র. ঐ, পৃঃ ৪২৩

৩৮. দ্র. ঐ, পৃঃ ৩৪৬

৩৯. সতীপ্রসাদ সেন, বঙ্গসমাজের একটি সুন্দর চিত্র (চিঠি) সোমপ্রকাশ ১৫ বৈশাখ ১২৮৭ প্রকাশিত; সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজচিত্র, সম্পা- বিনয় ঘোষ, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ২৮৮-২৮৯, এ উদ্ধৃত

৪০. মিসেস এম রহমান, আমাদের স্বরূপ, দ্রষ্টব্য জানানা মহফিল, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৯

৪১. ঊষাপ্রভা সেন- নারীর অবস্থা, ভারতী পত্রিকা, ফাল্গুন সংখ্যা, ১৩৩০ বঙ্গাব্দ

৪২. (সম্পা) বাণী মজুমদার, দুই পৃথিবীর উত্তরণ, স্ত্রী ২০০২, পৃঃ ২৯

৪৩. দ্র. আশালতা সিংহের গল্প সংকলন-২, পৃঃ ৩৩৮

৪৪. দ্র. ঐ, পৃঃ ৩৩৯

৪৫. দ্র. ঐ, পৃঃ ৩৩৯

৪৬. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সাম্য, পঞ্চম পরিচ্ছেদ, বঙ্কিম রচনাবলী, ১৮৪৯, কলকাতা, পৃঃ ৪০০